ভারতের গর্ব হাওড়া স্টেশন

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

হাওড়া স্টেশন নিয়ে লেখার আগে পূর্বরেলের ইতিহাসটা সংক্ষেপে একটু বলে নেওয়া যাক। ১৮৫৫ সালের গোড়াতেই ইস্ট - ইন্ডিয়ান রেলওয়ের লাইন পাতা হয়ে যায় হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত। ওই বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি সরকারিভাবে পূর্বভারতীয় রেলওয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয় বর্তমান শহরে। ফুল, পাতা দিয়ে স্টেশন চত্বরটি সাজানো হয়েছিল। কলকাতার লর্ড বিশপ অনুষ্ঠানের সূচনা করার পর সকাল ৯-৪০ মিনিটে ১৪ কামরার একটি ট্রেন বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ১৫ মিনিট পর ছাড়ে দ্বিতীয় আর একটি ট্রেন। সভাপতি হিসেবে গভর্নর জেনারেলের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও অসুস্থতার কারণে তিনি বর্ধমান না গিয়ে হাওড়া থেকে কলকাতায় ফিরে যান। বর্তমান পর্যন্ত রেল লাইনের ধারে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে ট্রেনটিকে দেখা মাত্র 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে চিৎকারে অভিনন্দিত করে। ১২-৩০ মিনিট নাগাদ প্রথম ট্রেনটি বর্ধমান পৌঁছয়। সেখানকার রাজা নিজে উপস্থিত থেকে অতিথি যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানান। ফিরতি যাত্রা শুরু হয় বেলা সাড়ে তিনটেয়। ট্রেনটি সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে এসে যখন পৌঁছয় তখন গ্যাসালোকে সজ্জিত হাওড়া স্টেশনটিকে ঝলমলে করে তুলেছিল। রেলপথে সরকারি উদ্বোধন উপলক্ষে আটদিন পর কলকাতার টাউন হলে এক বল নাচের আয়োজন হয়। সারা রাতধরে চলে আনন্দানুষ্ঠান। সেদিনও হাওড়া স্টেশনটিকে সাজানো হয়েছিল। তবে সেদিনের হাওড়া স্টেশন আর আজকের হাওড়া স্টেশন এক নয়। ১৮৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি সরকারিভাবে উদ্বোধন হলেও হাওড়া থেকে সাধারণ যাত্রীদের নিয়ে প্রথম ট্রেনটি চলেছিল ১৫ আগস্ট ১৮৫৪ তারিখে। প্রথম ট্রেন চলার সময় হাওড়া ছিল নগণ্য - গ্রাম মাত্র। তবে হাওড়া নয়, লোকমুখে উচ্চারিত হত হাবড়া। গ্রামটি ছিল দশআনি মহাশয়ের জমিদারির অন্তর্গত। এই গ্রামের সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটের নামও ছিল 'হাবড়া ঘাট'। এই ঘাটের আশেপাশে আরও অনেকগুলি ঘাট এবং ডাক ছিল। সেখানে জাহাজ মালপত্র ওঠা - নামা করা ছাড়াও জাহাজ নির্মাণ, মেরামতি এবং অঙ্গরাগ করানো হতো। স্থানীয় অধিবাসী অপেক্ষা এখানে ইংরেজদের বসতি ছিল বেশী। রেলচালু হবার মাস ছয়েকের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত কালিদাস মৈত্র লিখিত 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবষীয় রেলওয়ে' বইতে হাওড়া গ্রাম সম্বন্ধে এইসব তথ্য পাওয়া যায়। বইটিতে আরও উল্লেখ ছিল এখানে 'খ্রীষ্টিয় ধর্ম সুন্দররূপে শিক্ষার্থে বিসপস কলেজ নামক বিদ্যালয় আছে। অত্রস্থানে আর্য্যজাতির বসতি অল্প, সাহেবলোকের বসতি অনেক। বিশেষত: এই স্থান বড় বড় সপ প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত। এবং এই স্থানে রেলওয়ের অন্তিম আড্ডা (Station), সেই আড্ডার প্রতিকৃতি এই।

'এই হাওড়া উপস্থিত শকাব্দায় যে কলিকাতায় অদৃশ্য নগরী বা নূতন কলিকাতা নাম্নী হইবেক, তাহার সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে।'

রেলপথের প্রান্তিক স্টেশনের প্রতি যাত্রী সাধারণের আগ্রহ বা আকর্ষণ ছোটো - বড়ো সকলেরই। দু'দণ্ডের মুসাফির হলেও যাঁরা যাত্রা শুরু করেন বা শেষ করেন, প্রত্যেকেরই আলাদা টান থাকে। প্রথম দিকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না স্টেশনগুলির প্রতি। প্রান্তিক স্টেশনগুলিও হত বড়ো গুদামঘরের মতো। পরে যাত্রীদের ভিড় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের যাতায়াত ইত্যাদির কারণে স্টেশনের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। যত্ন করে বানাতে শুরু করে স্টেশন সৌধ। স্টেশনের সঙ্গে শুধু যাত্রী নয়, অন্য মানুষদেরও বহুতর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্টেশনের গঠনশৈলীর রূপও বদলাতে থাকে অবিরত। স্টেশন ভবন তখন আর শুধু রেল - ইঞ্জিন বা রেল কামরার বিশ্রাম ঘর নয়, যোগ হতে থাকে আরও অনুষঙ্গ। ক্রমে স্টেশন হয়ে যাছ বিশেষ বিশেষ শহরের 'ল্যান্ডমার্ক'। বইটির ভবিষ্যৎবাণীর মতো অচিরেই হাওড়া - গ্রামের উন্নতি না হলেও হাওড়া নামক 'আড্ডা' বা স্টেশনের উন্নতি হয়েছিল। এখন যেখানে ১৭ নম্বর পার্সেল - প্ল্যাটফর্ম, তার উত্তরদিকে পার্সেল শেডের কাছে ছিল হাওড়া থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়ার লাইন ও প্ল্যাটফর্ম। আগে এই স্থানটিতে একটি ফলকে লেখা ছিল 'ওরিজিন্যাল জিরো মাইল। ই আই রেলওয়ে'। অর্থাৎ প্রথম 'মাইল ফলক'। পরে অন্য একটি ফলকে লেখা হয় 'দিস ইস দ্য প্লেস- ফাস্ট ট্রেন অফ ই আই ডিয়ান র‍্যান ফ্রম দ্য প্লেস। /১৫-৮-১৮৫৪/ হাওড়া - হুগলি'। মূল স্টেশনটি ছিল লাল ইঁটের তৈরি একটি একতলা। ঘর, মাথায় কারোগেটের লোহার চাল। তবে বাইরে থেকে হাওড়া স্টেশন দেখতে ছিল গুরুগম্ভীর, সুরম্যভবন। ২২টি ডোরিক থাম বিশিষ্ট প্যালাডিয়ান ঐতিহ্যে তৈরি অট্টালিকার সামনের অংশের মতো। অনেকটা সেকালের টাউন হলের মতো, তবে আকারে ছোট। স্টেশনের ভেতর ছিল টিনের একটি ঘর, হাওড়ার লোকেদের জন্যে টিকিটঘর। কলকাতার যাত্রীদের জন্য টিকিটঘর ছিল নদীর ওপারে আর্মেনিয়ান ঘাটে। সেখানে রেলওয়ে টিকিটের সঙ্গে নদী পারাপারের লঞ্চের ভাড়াও নিয়ে নেওয়া হত। প্রথমে ছিল একটিমাত্র লাইন আর তার দু'পাশে দুটি প্ল্যাটফর্ম। ক্রমশ রেলের যাত্রী ও মাল পরিবহণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার দরুণ হাওড়া স্টেশনের লাইন বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হয়। লাইন বাড়াবার পাশাপাশি প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেশন ভবনটিকেও নতুন করে তৈরি করবার কথা ভাবতে বাধ্য হন রেল কর্তৃপক্ষ। আগে উল্লেখ করেছি প্রথমে ছিল একটি মাত্র লাইন আর একটি প্ল্যাটফর্ম। ১৮৬৫ তে যোগ হয় আরও একটি লাইন। আসলে ট্রেনের যাত্রা শুরুর জন্যে একটি এবং পৌঁছনোর জন্যে পৃথক লাইন ও প্ল্যাটফর্ম। ১৮৯৫ -তে তৈরি হয় তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মটি। প্ল্যাটফর্মগুলির দৈর্ঘ্য হত মোটামুটি পাঁচটি কামরার দৈর্ঘ্যের সমান। এদিকে পূর্বরেলের সঙ্গে হাওড়া - খড়গপুর অর্থাৎ তখনকার বেঙ্গল - নাগপুর রেলওয়ের (বি এন আর) অন্তিম স্টেশনটিও হাওড়া হওযাতে যাত্রীর সংখ্যা এক লাফে অনেকটা বেড়ে যায়। তার আগে বাংলা - নাগপুর রেলওয়ে শেষ হত টিকিয়াপাড়া স্টেশনে। এখন থেকে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম, আগে সেখানে ছিল একটি রোমান ক্যাথলিক বালক - বালিকাদের অনাথ আশ্রম। চালাতেন পর্তুগীজ মিশনারিরা। আশ্রমের পাশে ছিল ছোট্ট একটা গির্জা। নানান অসুবিধের কারণে আশ্রম ও গির্জাটি উঠে কলকাতায় চলে গেলে রেল কোম্পানি জায়গাটি কিনে সেখানে রেলগাড়ি মেরামতির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। পূর্ব ও বাংলা-নাগপুর রেলের যৌথ স্টেশন হওয়ার কথা শুরু হয় ১৮৯৬ -তে। পরিকল্পনামতো রেল মেরামতির কারখানাটিকে পশ্চিমে সরিয়ে এনে ওই স্থানটিতে নুতন স্টেশন তৈরি শুরু হয়ে যায়।

নতুন স্টেশন ভবনটির নকশা করেন হ্যালসি রিকোর্ডো নামে এক বিখ্যাত ইংরেজ স্থপতি। কলকাতার স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্নদেশের মিশ্র স্থাপত্য শৈলী। গ্রিস, ইতালি, হল্যান্ড, পর্তুগালের স্থাপত্যরীতির সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায় ইংরেজ রাজত্বে তৈরি কলকাতার প্রাসাদগুলিতে। ইংরেজরা চিরকালই প্রাসাদসম বাড়ি - ঘর তৈরি করতে স্থাপত্য শৈলিতে রোমান তথা গ্রিক স্থাপত্যের নকল করে গেছে। হাওড়া স্টেশনের নকশায় স্থপতি রিকার্ডো এনেছিলেন রোমান স্থাপত্য - শৈলী। হাওড়া স্টেশনের গঠনভঙ্গির মধ্যে সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা প্রভাব দেখা যায় লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনের স্থাপত্যের। তিব্বতি লামাদের মঠ আর ব্রিটিশ জেলখানার মিশ্রণে তৈরি হয় ভবনটির নকশা, ভবনটির দরজা - জানালার আর্চে নিয়ে আসেন রোমান শৈলী। ইংল্যান্ডের জেলখানার মতো এটিও লালরঙের হট দিয়ে তৈরি। আটটি বড় চৌকো মিনার, এর মধ্যে ছটি মিনারের মাথার দিকে বেশ চওড়া ঘুলঘুলি, অনেকটা তিব্বতি মঠের মতো। মিনারের মাঝখানের অংশে চৌকো ছাদ। জেলখানার মতো ছাদের ওপর কাঁটাওলা গম্বুজ। বাড়ির সম্মুখ ভাগ রেখেছিলেন নদীর দিকে। রিকার্ডো পরিকল্পনাটি করেছিলেন সুন্দর জ্যামিতিক প্রতিসমে দুই অংশে ভাগ করে। ঠিক মধ্যিখানে গাড়ি নিয়ে স্টেশনে ঢোকার রাস্তা বা ক্যাব - রোড ভবনটিকে দুভাগে ভাগ করে দেয়। গাড়ি ঢোকার প্রধান প্রবেশপথের দুদিকে গাড়ি বারান্দা। ভবনটির মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার স্কাইলাইট; ফলে আলো ছড়িয়ে পড়ে সমান ও কোমল হয়ে। কাজ শুরু হয়েছিল ১৯০১ সালে। এই ভবন নির্মাণের সময় রূপকার যে সমস্ত ঠিকাদার নিয়োগ করেন তার মধ্যে একজন ছিলেন বাঙালি - অনাদি

বন্দ্যোপাধ্যায়। অনাদিনাথ মি. বুল নামে এক ইংরেজের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা করতেন। মি. বুলের ইটভাটা ছিল উত্তরপাড়ার কোতরং-এ। হাওড়া স্টেশন তৈরি করতে যত ইট লেগেছিল তা এসেছিল বুলের ইটভাটা থেকে। এবং গোটা কাজটি তদারকি করেন অনাদিনাথ বাবু। স্টেশনের জল - কলের দায়িত্বেও ছিলেন অনাদিবাবু। স্টেশন তৈরির পাথর প্রথম এসেছিল ঝরিয়া থেকে পরে মির্জাপুরের পাথর ব্যবহৃত হয়। কাজশুরু হয়েছিল উত্তর দিকের প্ল্যাটফর্মগুলি তৈরি করা দিয়ে। অর্থাৎ ১ থেকে ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মগুলি। ১৯০৬-এর ১—৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মগুলি তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। এরপরেই ছিল ক্যাব– রোডের অবস্থান। তখন তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রামকক্ষ ছিল ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সোজাসুজি। ৭,৮ ও ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়ে যায় ১৯০৯ -এর মধ্যে। সম্পূর্ণ শেষ হতে গড়িয়ে যায় ১৯১১ সাল। যদিও স্টেশন ভবনটির কার্যকাল শুরুর দিন ধরা হয় যেদিন ওই ভবন থেকে স্টেশন মাস্টারের কাজ শুরু হয়, অর্থাৎ ১৯০৫ এর ১ ডিসেম্বর। নতুন ভবনের কাজ শুরুতেই স্টেশন মাস্টার -এর পদটি পরিবর্তন করে 'স্টেশন সুপরিটেডেন্ট' করে দেওয়া হয় এবং মাস - মাইনে বাড়িয়ে ৪০০ টাকার বদলে ৫০০ টাকা করা হয়। ১৯১০ -এর ৩ নভেম্বর রেল বোর্ডের এক চিঠিতে জানা যায় হাওড়ার স্টেশন ভবনের কাজ সম্পূর্ণ এবং খরচ হয়েছে পূর্বরেলের ৪,৩৬,৬১৪ টাকা। পূর্ব ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের যুগ্মভাবে ৪১,৭৩,৪৯০ টাকা এবং শুধু বেঙ্গল - নাগপুর রেলের ৫২,৫৯১ টাকা। যদিও মোট খরচ ৪৬,৬২,৬৯৫ টাকা দেওয়া হয়েছে পূর্ব রেলের খাত থেকে।

হাওড়া স্টেশনের নতুন ভবনটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্থাপত্যিক বৈভবের দিক থেকে তৈরি হয়ে উঠলো আর একটি মনোগ্রাহী অট্টালিকা। কর্মব্যস্ত স্টেশনটির কাজকর্ম ছাড়াও ইংরেজদের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল রাজশক্তির পরাক্রমকে মহিমান্বিত করা। হাওড়া স্টেশনের বাইরে থেকে দেখা তার রূপ সেদিক থেকে সম্পূর্ণ সফল। একদিক থেকে রেল এবং একই সঙ্গে ইংরেজদের মহিমা ব্যক্ত করতে এমন বাড়িরই প্রয়োজন ছিল। পরে মাদ্রাজ সেন্ট্রাল রেল স্টেশনটির স্থাপত্যে একই ধরণের নকশার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

যতদিন গিয়েছে বেড়েছে যাত্রী সংখ্যা, ফলে ট্রেনের সংখ্যও আগে ৬নম্বর প্ল্যাটফর্মে (বর্তমানে ৮ নম্বর) বেঙ্গল - নাগপুর রেলের ট্রেনের জন্যে ব্যবহৃত হত। ক্যাব - রোডের পাসের (বর্তমান ৯ নম্বর) প্ল্যাটফর্মে ছিল রেলের পার্সেল অফিস। পরে ৭,৮ ও ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্ম বেঙ্গল - নাগপুর রেলের জন্যে ব্যবহৃত হলে পার্সেল অফিস উঠে যথা প্রথম যাত্রা শরু প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ ডি আর এম অফিসের কাছে। ক্রমে ১৪টি প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়ে গেলে ওই 'প্রথম' -প্ল্যাটফর্মটির নম্বর হয়ে যায় ১৫। পরে ১৬ নম্বরে চলে যায় পার্সেল অফিস এবং ১৫ নম্বরটি 'ডক' (dock) প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। প্রসঙ্গত, ১৯৫৭, সালে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হবার পর ১ থেকে ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আরও দুটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়।

প্রথম দিকে স্টেশন থেকে বাইরের বেরোবার রাস্তা ছিল গোটা পূর্ব ও উত্তর অংশে। ১৯৬০ -এর দশকের শেষ দিকে পাতাল পথ তৈরির পর উত্তরদিকের অনেকটা অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় হুগলি সেতু তৈরি করার সময় ঠিক হয় যাত্রী সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সমস্যা বিধানে হাওড়া স্টেশনও বাড়ানো হবে। দক্ষিণ -পূর্ব রেলের দূরপাল্লা গাড়ির জন্যে পৃথক স্টেশন ভবনের কথা ভাবা হয়। ১৮ থেকে ২১ নম্বর, মোট ৪টি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে পুরোনো ভবনের সাদৃশ্যে ১৯৯৩ সালে তৈরি হয় নতুন স্টেশন ভবন। এই ভবনেই তৈরি হয়েছে রেস্তোরাঁ সহ হোটেল 'রেল যাত্রী নিবাস', ১৯৯০ দশকের শেষ দিকে একটি পায়ে হাঁটা সেতু নতুন ও পুরাতন স্টেশন ভবন দুটিকে যোগ করছে। নতুন ভবনের দক্ষিণ দিকে তৈরি হয়েছে আর একটি ক্যাব - রোড। ২০০৫ থেকে শুরু হয়েছে ২২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ এবং কম ব্যবহৃত ১৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মটিও যাত্রী - ট্রেনের জন্যে ব্যবহারের প্রস্তুতি চলছে।

রেলগাড়ির যাতায়াত যাত্রীসেবা ও অন্যান্য হিসেবপত্র ঠিক রেখে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে রেল যাত্রা শুরুর প্রথম দিনটি থেকে কয়েকটি অফিস ঘর তৈরি হয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। সর্বপ্রথম অফিসটি ছিল 'জেনারেল ট্র্যাফিক ম্যানেজার' -এর। এই মূহূর্তে হাওড়া স্টেশনে যে সমস্ত অফিস রয়েছে তার তালিকাটি হল : 'ডিভিশন্যাল ট্র্যাফিক ম্যানেজার', 'ডিস্ট্রিক্ট ট্র্যাফিক সুপারিন্টেডেন্ট', 'সিগন্যালিং অফিস', বুকিং অফিস, সুপারিন্টেডেন্ট অফিস, স্টেশন মাস্টার, ডেপুটি স্টেশন মাস্টার - কমার্শিয়াল, রেলওয়ে মেল সার্ভিসের অফিস, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে পার্সেল অফিস, ইনডোর স্টেশনমাস্টার, ডিভিশন্যাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের জন্য 'গেস্ট অফিস', 'রানিং রুম', মিলিটারি অফিস, অনুসন্ধান অফিস, আর.পি.এফ এবং জি.আর.পি -দের অফিস।

হাওড়া স্টেশনের আর একটি বিশেষত্ব রেলের বিভিন্ন অফিস ছাড়াও যাত্রীদের প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন সমস্ত জিনিস পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। চা-কফির স্টলের পাশাপাশি ফল ও ফলের রসের দোকান, নানা ধরনের খাবারের স্টল, ওষুধ ও মনোহারি জিনিসের দোকান, ১৯৫৫ -তে স্থাপিত ব্যাঙ্ক, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, বইয়ের দোকান, টেলিফোন করার ব্যবস্থা, রাজ্য সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের শাখা, ডাকঘর, ১৮৫৫ সালে স্থাপিত আমানতী মালিঘর (ক্লোকরুম), ১৯৩৯ সালে তৈরি চুল - দাড়ি কাটার সেলুন গাছের বীজ- চারা, ফুল, ও বাগান করার যন্ত্রপাতি বিক্রীর জন্যে গ্লোব নার্শারির শাখা (১৯৪৩)। হাওড়া স্টেশনে অবস্থিত 'হুইলার' -এর বইয়ের দোকানটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ইংল্যান্ডে নির্মিত সম্পূর্ণ বার্মা - টিকে তৈরি দোকানঘরটি জাহাজে করে নিয়ে এসে ১৯০৫ সালে হাওড়া স্টেশনে বসানো হয়। আজ ভারতের বিভিন্ন স্টেশনে হুইলার - স্টল রেলের গর্ব। একসময় এঁরা রেলে পড়বারজন্য বইও প্রকাশ করত।

আমিষ - নিরামিষ ভোজনালয় ছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের জন্যে তৈরি হয়েছে দুটি ফুড-প্লাজা; নতুন ভবনে ২০০৩ -এ, পুরনো ভবনে ২০০৪ সালে। সদ্য সংযোজনে হয়েছে সাইবার - কাফে)। যাত্রীদের সুবিধেয় জন্যে এমন ব্যবস্থা বিশ্বের আর কোন রেল স্টেশনে নেই। এছাড়া সরকারী ব্যবস্থায় রয়েছে ৩টি অপেক্ষা - গৃহ। রয়েছে ৫২টি টিকিটঘর, কম্পিউটারকৃত সংরক্ষিত টিকিট কাটার জন্যে ১৬টি কাউন্টার। সব মিলিয়ে টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা ৭৫টি। প্রত্যেকদিন হাওড়া স্টেশনে টিকিট বিক্রি, মাল ভাড়া ও বিজ্ঞাপন থেকে রেলের ঘরে জমা পরে যথাক্রমে ৪০ লাখ, ৭/৫ লাখ ও ১.০৯ লাখ টাকা। হাওড়া স্টেশনের আর একটি ল্যান্ডমার্ক ক্যাব - রোডের ধারে দুমুখো বিখ্যাত 'বড় ঘড়ি'। বিশ্বখ্যাত 'জেন্টস কোম্পানি'র (Gents) তৈরি ঘরিটি বসানো হয়েছিল ১৯২৬ সালে। গত বছর হাওড়া স্টেশনের নতুন সংযোজন 'রেল মিউজিয়াম' তৈরি হয়েছে ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণে।

প্রত্যেকদিন হাওড়া স্টেশনে যাতায়াত করে প্রায় ৪১২টি লোকাল ট্রেন ও ১৭৯টি মেল/ এক্সপ্রেস। এগুলিকে সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্যে আগে ছিল ৪৮৮ 'রুট'। ২০০৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর এক বিরাট কর্মযজ্ঞে নতুন 'রুট রিলে' আন্তর্জাল পদ্ধতিতে ১১৯৭টি রুটের ১৮৭টি সিগন্যাল, ১৫৬টি 'ক্রশ ওভার' অর্থাৎ বিভিন্ন লাইনের পারস্পরিক সংযোগকারী পয়েন্ট এবং ৭২ হাজার 'জাম্পার ওয়্যার' -এর মাধ্যমে ট্রেনের যাতায়াত বা হাওড়া স্টেশনে ঢোকা ও বেরোবার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। 'ওয়ার্ল্ড সিঙ্গল্ লারজেস্ট রেলওয়ে স্টেশন রুট রিলে ইন্টারলকিং, নেটওয়ার্ক' হিসেবে 'গিনেজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, বইতে বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে।

সবশেষে শুধু একটুই বলি, বিভিন্ন ধর্ম - ভাষা ও দেশ নির্বিশেষে প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ ব্যবহার করে এই হাওড়া স্টেশন। মানুষের মহান মিলনক্ষেত্র ছাড়া একে আর কি-ই বা বলা যায়! ১৫২ বছর পরেও ২১টি প্ল্যাটফর্ম পাঁচ শতাধিক ট্রেন এবং ১০ লাখের বেশি দৈনিক যাত্রী নিয়ে হাওড়া স্টেশন ভারতের ব্যস্ততম স্টেশনের গৌরব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

লেখক পরিচিতি : গ্রন্থকার, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গ্রন্থাগারিক দৈনিক আজকাল পত্রিকা।